e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৬ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | সেপ্টেম্বর ২০১৫

জানা অজানা

এক কেজি লোমের জন্য ৫০ বেজি হত্যা করা হয়

চাষিদের তারা খুব বন্ধু। কারণ ক্ষেতে বাস করা পোকা-মাকড়, ছোটখাটো প্রাণীদের খেয়ে ফেলে দিব্যি তারা ফসলের ক্ষতি আটকায়। কিন্তু হলে কী হবে অত্যন্ত উপকারি এই বন্ধুটিকেও তথা বেজিদের মেরে মেরে প্রায় নির্বংশ করে ফেলা হচ্ছে ভারতে। কারণ দেশে বিদেশে তাদের চুল বা লোমের যে বিপুল চাহিদা, যা দিয়ে তৈরি হয় ছবি আঁকার ব্রাশ বা তুলি। ডাউন টু আর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে চোরা শিকারিরা বছরে প্রায় ৫০ হাজার বেজি হত্যা করছে। আইন অনুযায়ী ভারতে সব ধরনের বেজিই সংরক্ষিত তালিকাভূক্ত এবং বেজির চুল নিয়ে ব্যবসা সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু তাও ঘটে চলেছে এই নৃশংস হত্যা কান্ড। গত মার্চে বন দপ্তর কোচি থেকে ১৪০০০ তুলি আটক করেছে যেগুলি মনে করা হচ্ছে ওই বেজির লোম দিয়েই তৈরি হয়েছে। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের নানা দেশেই এই বেজির লোম থেকে তৈরি তুলির চাহিদা খুব। সাধারণত

এবার ২ পাতায়

ঘরে ঘরে গিজগিজ করে বন্যপ্রাণী

তারা পোষ মানে না, বাতাসে ভাসে, বসে থাকে আমাদের চোখে মুখে

technologytell.com

আমাদের সকলের বাড়িতে, বাড়ির প্রতিটি ঘরে, বন্য প্রাণী গিজগিজ করে দিনরাত। তাদের সঙ্গেই আমাদের ওঠা বসা, খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা, ঘুমনো। বন্য প্রাণী বলতে জঙ্গলের বাঘ ভালুক না হলেও তাদের মতোই বুনো আমাদের ঘরের প্রাণীরা যাদের পোষ মানানো অসম্ভব। তাদের চোখে দেখা যায় না, তারা কারওর আদেশ মেনে চলার পাত্র নয়। তারা কেউ ভাসে বাতাসে, কেউ চরে বেড়ায় আসবাবপত্রে, কেউ বা তাদের আস্তানা গড়ে আমাদের শরীরে। তারা জীবাণু।

গবেষণা করে দেখা গেছে যে বাড়ির উঠোনে যত না জীবাণুর বৈচিত্র তার চেয়ে ঢের বেশি বৈচিত্রময় জীবাণু থাকে আমাদের বাড়ির ঘরের মধ্যে। যেমন আমাদের শরীরেই বাস করে নানা ধরনের কয়েক কোটি জীবাণু। আর পরিবারে যদি দু'একটি পোষ্য থাকে, যেমন কুকুর বা বেড়াল, তা হলে জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণা থেকে বাড়ির মধ্যে এই জীববৈচিত্রের নানা কথা জানা গেছে। আর গবেষকরা অভয় দিয়ে এও বলেছেন যে ঘরোয়া ওই জীবাণুদের বেশির ভাগই আমাদের কোনও ক্ষতি করে না। উপরন্তু ছোটবেলা থেকে তারা আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে আমাদের উপকারই করে।

দেখা গেছে বাড়ির জীবাণুরা মূলতঃ আসে মানুষ ও তাদের পোষা প্রাণীদের শরীর থেকে। প্রতিটি মানুষের দেহ বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর আস্তানা। আমরা যখন ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করি তখন আমারা শরীরের জীবাণু ছড়াতে থাকি চারদিকে। বাড়িতে যদি কুকুর, বেড়াল, পাখি, গরু বা ছাগল থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই জীবাণুর সংখ্যা ও বৈচিত্র দুইই বেড়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একটি বাড়িতে কী কী ধরনের জীবাণু আছে তা থেকেই বোঝা যায় সে বাড়িতে কাদের বাস। জীবাণু বৈচিত্র দেখে তাঁরা বলে দিতে পারেন সে বাড়িতে মানুষ ছাড়াও কুকুর থাকে না বেড়াল। এটা সম্ভব হয় কারণ বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে স্বতন্ত্র প্রজাতির জীবাণু বাসা বাঁধে। ফলে কুকুরের শরীর থেকে আসে এক ধরনের জীবাণু, বেড়াল থেকে অন্য প্রকারের। তাই থেকেই বোঝা যায় বাড়িতে কুকুর আছে কি বেড়াল, না কি আছে উভয়ই, না কি অন্য কোনও পোষ্য। বিজ্ঞানীরা বলছেন তাদের উপস্থিতি মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে, অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

শুধু তাই নয়। জীবাণুর চরিত্র দেখে বলে দেওয়া যেতে পারে যে একটি বাড়িতে পুরুষরা বেশি থাকে না কি মেয়েরা। এও সম্ভব সেই একই কারণে –

এবার ২ পাতায়

সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে 'মৃত অঞ্চল'

আমরা যেখানে থাকি – যে বাড়িতে, যে পাড়ায়, যে গ্রামে বা যে শহরে – সেখানে যদি হঠাৎ এক সকালে বাতাস থেকে অক্সিজেন উবে যায় তাহলে কেমন হবে পরিস্থিতিটা? নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বাতাসও যাচ্ছে শরীরে, কিন্তু তাতে অক্সিজেনের লেশমাত্র নেই – অবস্থাটা কল্পনা করাও শক্ত! অথচ ঠিক এমনই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে সমুদ্রের প্রাণীদের কারণ সেখানে এক এক জায়গায় বিশাল এলাকা জুড়ে জলে অক্সিজেনের বিরাট ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ফলে সে সব জায়গা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে ছোটবড় সব প্রাণীকেই। আর যারা পারছে না, মারা পড়ছে তারা।

পৃথিবীর অনেক সমুদ্রেই এমন অঘটন ঘটছে। তবে ভারতের পশ্চিমে আরব সাগরে সব চেয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে – যার আয়তন হবে প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার – ওই 'মৃত অঞ্চল' সৃষ্টি হচ্ছে বছরের

এবার ২ পাতায়

জলে হেঁটে চলে পোকা

পুকুর পাড়ে বসে থাকলে বোঝা যায় যে জলের ওপর দিব্বি হাঁটাচলা করা সম্ভব। জলের ওপর দিয়ে হাঁটা যায়, দৌড়ন যায়, এমনকী ইচ্ছে করলে হাইজাম্পও দেওয়া যায়। তবে এও ঠিক যে মানুষ তা পারে না। যারা পারে তারা এক ধরনের জলের পোকা। পায়ের ওপর ভর করে তারা জলের ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত গতিতে চলে বেড়ায়। দেখলে মনে হয় তারা যেন বরফের বদলে জলের ওপর স্কেটিং করায় ব্যস্ত। জলে-হাঁটা পুকুরের পোকারা চিরকালই ছিল, তবে এখন তারা বিজ্ঞানীদের নজর কেড়েছে। তাদের ওই আশ্চর্য ক্ষমতা এখন দক্ষিণ কোরিয়ার সোল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। তাঁরা ওই পোকাদের শরীরের গঠন আর তাদের চালচলন গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদেরই অনুকরণে তৈরি করেছেন এমন এক রোবট যা জলের ওপর হাঁটে, জলের ওপর দাঁড়িয়েই লাফ দিতে পারে। মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে ওই রোবট মানুষের নানা কাজে আসবে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

ঘরে জীবাণু

১ পাতা থেকে

পুরুষদের শরীরে কিছু বিশেষ ধরনের জীবাণুর আধিক্য থাকে, আর মেয়েদের গায়ে অন্য ধরনের। বলা হচ্ছে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের গায়ের চামড়ায় অনেক বেশি পরিমাণ জীবাণু বাস করে। সে যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এমন উন্নত ব্যবস্থা থাকলে ব্যোমকেশ বক্সি বা শারলক হোমস-এর মত দুঁদে গোয়েন্দাদের রহস্য সমাধানের কাজ কিছুটা সহজ হত নিশ্চয়ই! জীবাণু বৈচিত্র অনুধাবন করেই কোনও এক রহস্যাবৃত বাড়ির বাসিন্দাদের সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করে নিয়ে সত্যান্বেষণে আরও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারতেন।

সূত্রঃ ডিসকভার.কম

অসুখ করলে পিঁপড়েরাও ওষুধ খায়

কেবল আমরা নই, পিঁপড়েরাও ওষুধ খায়। দেখা গেছে শরীর খারাপ হলে ছোট, বড় সব প্রাণীই প্রকৃতি থেকে তাদের রোগ নিরাময়ের উপাদান খুঁজে নেয়। যেমন, কুকুরদের মাঝে মাঝেই ঘাস পাতা খেতে দেখা যায়। সেগুলি তাদের পেট ঠিক রাখার জড়িবুটি। এখন 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে পিঁপড়েরাও ওষুধ খেয়ে রোগ সারায়।

এক ধরনের ছত্রাক – বিউভেরিয়া বেসিয়ানা – পিঁপড়েদের মারাত্মক ক্ষতি করে। ওই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হলে মারা যায় তারা। তাই ওই ছত্রাক প্রতিহত করতে পিঁপড়েরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নামক এক বিষাক্ত পদার্থ আহরণ করে। আর তার ফলে তাদের শরীরে বাসা-বাঁধা ছত্রাক মারা যায় এবং বেঁচে যায় আক্রান্তরা।

ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা পিঁপড়েদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। দুটি পাত্রে – ১-নং আর ২-নং – রাখা হয় মধু আর জল মিশিয়ে তৈরি সিরাপ। তার মধ্যে ২-এ মিশেয়ে দেওয়া হয় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। দু দল সুস্থ সবল পিঁপড়েদের ১ আর ২ পাত্রের সিরাপ খাওয়ান হয়। যারা ১-নং থেকে খায় তারা ভালই থাকে। অপর দিকে, ২-নং সিরাপ সেবন করে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকে।

নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা

এবার পরীক্ষায় পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১ ও ২ নং সিরাপ যেমন ছিল তেমনই থাকে। কিন্তু এবার সুস্থ পিঁপড়েদের বদলে নিয়ে আসা হয় দু দল ছত্রাক-আক্রান্ত পিঁপড়ে। যারা ১নং সিরাপ খায় তারা ছত্রাকের প্রকোপ থেকে নিস্তার পায় না। যারা ২নং, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মেশান, সিরাপ খায় তাদের অনেকেই ছত্রাক প্রতিহত করে ভাল হয়ে ওঠে।

আবার এও দেখা যায় যে অসুস্থ পিঁপড়েরা ওষুধের তীব্রতা বুঝে কতটা খাবে সেই মাপ ঠিক করে নেয়। পরীক্ষায় লক্ষ করা যায় যে ২নং সিরাপে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়াতে অসুস্থ পিঁপড়েরা তা খাচ্ছে কিছুটা কম পরিমাণে।

ঠিক যে ভাবে আমরা অ্যান্টিবায়টিক খাই – ২৫০ মিলিগ্রাম হলে দিনে দুবার আর ৫০০ হলে দিনে একবার!

সূত্রঃ ডিসকভার.কম

শিল্পীর ক্যানভাসে বেজির রক্ত

১ পাতা থেকে

উত্তরাখন্ড, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়-, ছত্তিশগড় ইত্যাদি নানা রাজ্য থেকেই তাদের লোম সংগ্রহ করা হয়। এবং জানা যাচ্ছে যে এক কেজি লোমের জন্য প্রায় ৫০ বেজি মারা হয়। আর দিল্লি, মুম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা ইত্যাদি জায়গার মধ্যে দিয়েই ওই লোম পাচার হয়ে যায়। শিল্পীরা বোধহয় জানেনও না রঙে ডুবিয়ে যে তুলির এক একটা আঁচড়ে তাঁরা কাগজে ছবি ফুটিয়ে তোলেন, সেই তুলির গায়ে অনেক অদৃশ্য রক্তও লেগে থাকে। তবে শুধু ছবি আঁকার জন্যই নয়, তাদের লোমের ব্রাশ ব্যবহার করা হয় মেকআপ বা সাজানোর জন্যও। অনেকে আবার বেজি পোষেও।

আশার কথা 'ট্র্যাফিক' নামে একটি নেটওয়ার্ক যারা বন্যপ্রাণী নিয়ে ব্যবসার ওপর নজরদারি করে, এই বেজি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তারা প্রচার চালাচ্ছে গত ফেব্রুয়ারি থেকে। অবশ্য এই প্রচার একেবারে তৃণমূল স্তরে অর্থাৎ যেখানে বেজি ধরা হচ্ছে, তাদের পিটিয়ে মারা হচ্ছে সেখানে না পৌঁছতে পারলে সন্দেহ নেই অচিরেই বেজিরা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং চাষিরা হারাবেন তাঁদের এক উপকারি বন্ধুকে।

সমুদ্রে মৃত অঞ্চল

১ পাতা থেকে

বিশেষ সময়ে। শীতের মরশুমে সমুদ্রে রঙ উজ্জ্বল সবুজ হয়ে যায়, কারণ সে সময় কোটি কোটি প্ল্যাঙ্কটন, যা হল এক ধরনের খুব ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ, ছেয়ে যায় সমুদ্রের জলে। সমুদ্রের বুকে ওই সবুজ ছাপ এতটাই বড় হয় যে তা মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। ওই প্ল্যাঙ্কটনের আধিক্যই বিপদ সৃষ্টি করছে অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে। ওই উদ্ভিদ রাশি যখন মরে গিয়ে পচতে শুরু করে তখন সেখানে অতিমাত্রায় জীবাণুর জন্ম হয়।তারা সমুদ্রের জল থেকে ক্রমাগত অক্সিজেন শুষে নিতে থাকে। ফলে ওই জায়গায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে থাকে। তবে কি অতিরিক্ত প্ল্যাঙ্কটন আগে জন্মাত না সমুদ্রে? না। বলা হচ্ছে চাষের জমিতে যে বিপুল রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তার একটা বড় অংশ বৃষ্টির জলে ধুয়ে খালবিল, নদীনালা হয়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে মেশে। আর ওই রাসায়নিক সারই প্ল্যাঙ্কটনের বাড়বাড়ন্তের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রে।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

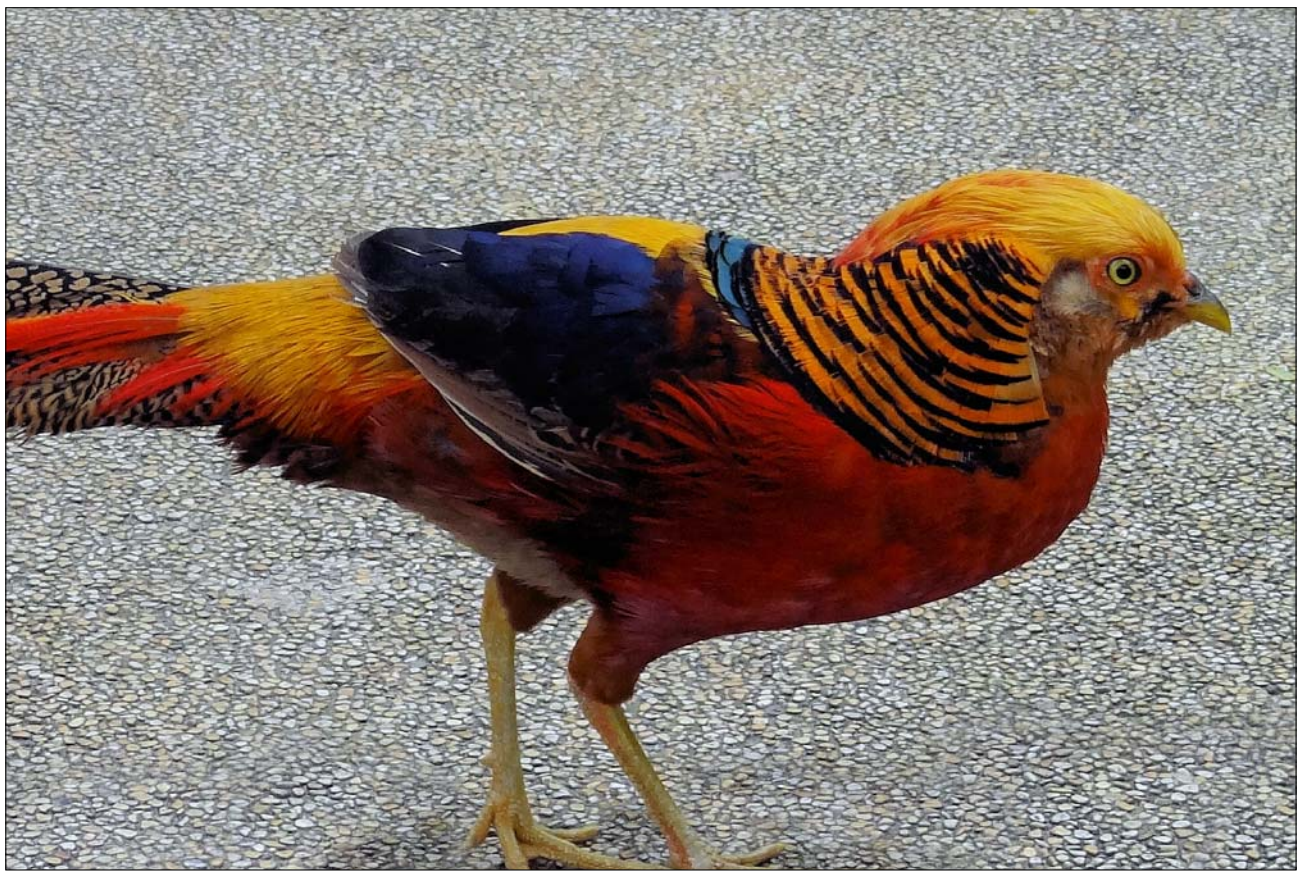

গোল্ডেন ফেসান্ট

কী অপূর্ব রঙের বাহার তার। লাল শরীর, সোনালি চুল, খয়েরি লেজ নিয়ে তার মনোহারি রূপ সবাইকে আকৃষ্ট করে। চিন, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আশপাশের অঞ্চল সর্বত্রই এই ফেসান্ট'র বিচরণ ক্ষেত্র। এই পাখির রয়েছে এক অদ্ভূৎ ক্ষমতা। বিপদে পড়েছে কি না তা খুব সহজে এবং খুব দ্রুতই তারা টের পেয়ে যায়। জীবনের কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, কোনও হুমকি যেন তারা আগাম বুঝতে পারে। গাছের বীজ, শিকড় পাতা ও জঙ্গলের নানা রকমের বেরি তাদের খাদ্য। খাদ্য পোকামাকড়ও। মেয়ে পাখিরা ৯-১১ ডিম পাড়ে। আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই তারা ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে। এই লাজুক প্রকৃতির গোল্ডেন ফেসান্টদের - সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করেন চিনারা।

গিনেস বুক-এ নতুন বেড়াল

গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ এক বিশেষ প্রবীণের নাম যোগ হয়েছে সম্প্রতি। নাম তার করডুরয়। বাসস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনিই এখন পৃথিবীর প্রবীণতম জীবিত বেড়াল। বয়স ২৬ বছর। এর আগের রেকর্ডধারী ছিলেন টিফানি-২। কিছুদিন আগে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭ বছর ২ মাস ২০ দিন। পোষা বেড়াল সাধারণত এতদিন বাঁচে না। তাদের আয়ু

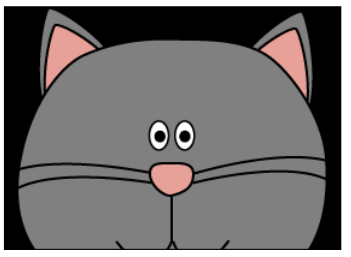

১২ থেকে ১৫ বছর। কিছু কিছু বেড়ালকে অবশ্য ২০ বছর পর্যন্তও বাঁচতে দেখা যায়। তবে যেটি সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচে ছিল তার নাম ক্রিম পাফ। বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর ৩ দিন।

সূত্রঃ লাইভ সায়েন্স

কেমন আছে সুন্দরবন এখন?

সুন্দরবনের গাছপালা-পশুপাখির ওপর জলবায়ু বদলের কী প্রভাব সেই বিষয়টা বুঝতে ওখানে নানা কেন্দ্র তৈরি হবে। সেগুলি বানাবে ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ। এই জরিপ কেবল অবস্থা বোঝার জন্য নয়, জলবায়ু বদলের ফলে যা যা হচ্ছে, যা যা প্রভাব পড়ছে সেই সব নিয়ে ভাবা ও তার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্যও। বাদাবনের বাস্তুতন্ত্র ধরে জলবায়ু বদলের প্রভাব

দেখার ব্যবস্থা এই প্রথম।

এই রকম আরও এক কেন্দ্র তৈরি করা হবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও মালাবার উপকূলে। এই কেন্দ্রগুলি ওখানকার প্রবাল প্রাচীরের ওপর জলবায়ু বদলের কী প্রভাব পড়ছে তা বোঝার চেষ্টা করবে।

সূত্রঃ পরিষেবা

১০ হাজার বছর আগে জাতে ওঠে এই জংলি গাছ

জেনে রাখা ভাল

জংলি গাছ থেকে কবে সে ঠিক মানুষের ব্যবহার্য হিসেবে মর্যাদায় আসীন হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে মোটমুটি ১০ হাজার বছর আগে নিউগিনিতে সে জাতে উঠেছিল। আরও জানা যায় যে -

- তিন হাজার বছর আগে থেকেই ভারতে আখের ব্যাপক চাষ হত এবং ভারতই চিনির মাতৃভূমি।
- ইউরোপ অবশ্য চিনির প্রথম স্বাদ পায় ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। যখন আলেকজান্ডার সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর সৈন্যরা এখানে স্বাদ পাওয়া 'হানি পাউডার' তথা চিনি সঙ্গে করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- মিষ্টি বা চিনি নানা রকমের লতাপাতা ও ফলের মধ্যে থাকে। তবে আখে ও বিটরুটে সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।
- দেখা গেছে যে হারে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তার থেকে দ্রুত বেড়েছে চিনির ব্যবহার। এবং চিনির উৎপাদন বেড়েছে আরও দ্রুততায়।

- চিনি খুবই উপাদেয় খাদ্য উপাদান হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ভারত থেকে এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে চিনির রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে তা সাদরে গৃহীত হয়।
- সাধারণত বছরে মাথাপিছু চিনির গড় ব্যবহার ২৪ কেজি। তবে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অনেকটা বেশি প্রায় ৩৩ কেজি।
- মিষ্টি খাবার না হলেও চিনির ব্যবহার চলে নানা ধরনের খাদ্যে।
- তবে বহুদিন পর্যন্ত চিনি বেশ দামি দ্রব্য হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। তার আর এক নাম ছিল 'হোয়াইট গোল্ড'।
- এমনিতে চিনির কোনও পুষ্টি মূল্য নেই। বরং দেহে তার ক্ষতিকর প্রভাবই আছে।
- বেশি চিনি খেলে মোটা হয়ে যায়। এবং দাঁতের ক্ষয়ের জন্য প্রধানত দায়ী করা হয় ওই চিনিকেই।

সূত্রঃ সুগারহিস্ট্রি.নেট

আমুর লেপার্ডের ছানা হওয়ায় উৎসব শুরু

ঠিক জন্মের সময়ই তারা ক্যামেরা বন্দী হয়ে গেল। ডনকাস্টারে 'ইয়র্কশায়ার ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক'এ অবশ্য আগে থেকেই সিসিটিভি লাগানো ছিল। তাই এই আমুর লেপার্ড'র সদ্যজাত তিন ছানার কথা আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেলাম। আসলে এই আমুর লেপার্ডরা এতটাই বিপন্ন যে তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে মাত্রই ৭০ ছিল। এই নতুন তিন লেপার্ডের জন্ম স্বভাবতই বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে। ডনকাস্টারে তো বলা যায় রীতিমত উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

চিরকালের জন্য এই আমুর লেপার্ডরা বিলুপ্ত হতে হতেও বোধহয় শেষরক্ষা হচ্ছে এভাবেই। কারণ ২০০৭ সালেও সংখ্যায় তারা ৩০ এ নেমে গিয়েছিল। চিনে তাদের আর খোঁজ মেলে না। রাশিয়ায় তারা এখনও অবধি টিকে আছে। খুব ঠান্ডা পাহাড়ি এলাকায় তাদের ক্বচিৎ দেখা যায়। অন্য লেপার্ডদের থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য গরমের সময় তাদের লোমের দৈর্ঘ্য হয় ২.৫ সেন্টিমিটার আর শীতের সময় সেই লোমই হয়ে যায় ৭ সেন্টিমিটার। শুধু তাই নয় গ্রীষ্মে তাদের লালচে হলুদ রঙ শীতে অনেকটাই হাল্কা হয়ে যায়। তাদের পা বেশ লম্বা,

হয়ত বরফের ওপর দিয়ে হাটতে পারার জন্যই প্রকৃতি তাদের উপযুক্ত করেছে।

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ আমুর লেপার্ডদের ওজন হয় ৩২-৪৮ কেজি, মেয়েদের ২৫-৪৩ কেজি। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে কোনও কোনও পুরুষ আমুর লেপার্ড ৭২ কেজিও হয়। এক সময় উত্ত-পূর্ব চিন জুড়ে ও উত্তর কোরিয়ার কিছু অঞ্চলও তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এক দিকে ক্রমাগত বসতি সঙ্কোচন, অপর দিকে সনাতনি ওষুধ প্রস্তুতে তাদের দেহাংশ এবং তাদের চামড়ার চাহিদা মেটাতে শিকার হতে হতে তারা এই দুই দেশেই নিশ্চিহ্ন। রাশিয়াতেও তাদের দিন প্রায় ফুরিয়েই এসেছিল। সত্তরের দশকে তাদের ৮০%ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের অসাধারণ সুন্দর চামড়া। আর সেটাই তাদের নিধনের বড় কারণ।

বিপন্ন যারা

অরণ্যে আমুর লেপার্ডরা ১০-১৫ বছর বাঁচে। তবে কোথাও সংরক্ষণ করলে বাঁচে ২০ বছরও। তারা বাচ্চা দেয় ১-৪। হরিণ, খরগোস, বুনো শুয়োর, বেজার ইত্যাদি আমুর লেপার্ডদের খাদ্য। আবার স্থানীয় মানুষও খাওয়ার জন্য ওই হরিণ খরগোস ইত্যাদি শিকার করে। ফলে বিবাদ উভয়েরই। আর বন্য খাবারের অভাবে লেপার্ডরা মাঝে মাঝেই হরিণ খামারে হানা দেয়। তখন যা হওয়ার তাইই ঘটে। অনেক সময় খামার মালিকরা আগাম প্রতিরোধি ব্যবস্থা হিসেবে হানা দেওয়ার আগেই লেপার্ড মেরে ফেলে। ফলে জীবনের এই হুমকি তাদের সর্বতোভাবে বিপন্ন করে ফেলেছে।

তবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার'র সহায়তায় রাশিয়ায় সরকার শিকার প্রতিরোধি ব্যবস্থা, তাদের দেহাংশ চালান বন্ধ, তাদের খাদ্যের জোগান বাড়ানো ইত্যাদি নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংরক্ষণ প্রকল্পও চালানো হচ্ছে।

সূত্রঃ ডবলিউডবলিউএফ

পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল ফুটল জাপানের উদ্যানে

তাকে দেখতে জাপানে টোকিওর জিন্দাই ন্যাশনাল পার্কে লম্বা লাইন। শ'য়ে শ'য়ে জাপানি পর্যটকদের ভিড় সামলাতে উদ্যান কর্মীরা প্রায় হিমসিম খাচ্ছেন। কারণ সম্প্রতি ওই উদ্যানে গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম ফুটল সেই ফুল - 'টাইটান এরাম'। পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল হিসেবে পরিচিত ওই পার্কে ফোটা বিরল প্রজাতির এই দৈত্যাকার ফুলটি দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, আমোদিত হওয়ার মতো কোনও সুগন্ধ তার নেই। বরং গন্ধ তার বিকট, অনেকটা পচা মাংসের মতো।

দীর্ঘকায় এই ফুলটির একটাই পাপড়ি। ফুলটি প্রায় ৩ মিটার বা ১০ ফিটের মতো লম্বা হয়। ফুলের বাইরেটা হাল্কা হলদে আর ভিতরটা কালচে লাল রঙের এই ফুল ফোটার পর ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা ফুটে থাকে। আর ওই সময়কালের মধ্যে বিদ্যুটে মাংস পচা গন্ধ ছড়িয়ে সে পরাগমিলনকারীদের আকর্ষণ করে।

ইন্দোনেশিয়ায় একমাত্র পশ্চিম সুমাত্রার বর্ষারণ্যই তার প্রাকৃতিক আবাসস্থল। পাহাড়েরর গায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০-৩৬৫ মিটারের মধ্যে তার দেখা মেলে। তবে ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার সংক্ষেপে আই ইউ সি এন'র তালিকায় 'বিপদসম্মুখীন' হিসেবে চিহ্নিত এই টাইটান এরামকে পৃথিবীর নানা উদ্যানে দেখা যায়। অনেক বোটানিকাল গার্ডেনে তার চাষ হয়।

গাছ লাগানোর পর প্রথম ফুলটি ফুটতে লাগে ৭-১০ বছর। এবং প্রথম ফোটার পর কেউ কেউ দু তিন বছর অন্তর অন্তর ফুটতে থাকে। কেউ আবার ৭/১০ বছর লাগিয়ে দেয় দ্বিতীয়বার ফোটার জন্য। ডালপালাহীন এই গাছে ফুলের একটাই পাপড়ি। কিন্তু ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলে বিরল এবং আশ্চর্য ফুল এই টাইটান এরাম ক্রমশই বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

সূত্রঃ বিবিসি, উইকিপিডিয়া

বিলুপ্তির পথে সুমাত্রার গন্ডার

ভারতে গন্ডার আছে, আছে আফ্রিকাতেও। আর আছে ইন্দোনেশিয়ায় – সুমাত্রার গন্ডার বলে যারা পরিচিত ছিল। এক সময় এই প্রাণীটিকে মালয়শিয়াতেও দেখা যেত। এখন যায় না আর। বিগত সাত বছরে একটিও গন্ডার দেখা যায়নি সেখানে। যে শ' খানেক সুমাত্রার বুনো গন্ডার এখনও আছে, তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলেই। কিন্তু মনে করা হচ্ছে যে তাদের সংখ্যা এতটাই কমে গেছে যে তাদের আর বিলুপ্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ইউনিভারসিটির সঙ্গে যুক্ত প্রাণীবিজ্ঞানী র‍্যামসাস হ্যাভমোলার সুমাত্রার গন্ডারদের নিয়ে গবেষণা করছেন। উনি বলেছেন অতিরিক্ত শিকার আর ১৯৮০ সাল থেকে নির্বিচারে বন ধ্বংস তাদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

ঘন্টায় হাজার বার বিদ্যুতের ঝলক

বছরে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৫০ বার বিদ্যুৎ'র ঝলকানি। হ্যাঁ ভেনিজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদ এলাকায় ঘটা এই ঘটনা তাকে গিনেস বুক'এ স্থান করে দিয়েছে - পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ঘনত্বের জায়গা হিসেবে। কথায় বলে এক জায়গায় দু'বার বিদ্যুৎ চমকায় না। কিন্তু ভেনিজুয়েলায় এই হ্রদে এক ঘন্টায় প্রায় হাজার বার বিদ্যুতের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিবিসি- আর্থ'এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে এই বিশেষ ঘটনা নানা নামেও পরিচিত। যেমন - বেকন অফ মারাকাইবো, কাটাটুম্বো লাইটনিং অথবা দীর্ঘস্থায়ী ঝড়।

অনেকে মনে করেন এই ব্যাপারে হয়তো কিছু অতিশয়োক্তি আছে। তবে এটা ঠিক যে কাটাটুম্বো নদী যেখানে মারাকাইবো হ্রদে মিলছে সেখানে বছরে গড়ে ২৬০ বার ঝড় হয়। সেখানে প্রাকৃতিক বিদ্যুতেই রাতের আকাশ প্রায় ৯ ঘন্টা ধরে আলোকিত থাকে।

গ্রীষ্মকালীন ঝড় বা আমাদের কালবৈশাখির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু বিষুবরেখা অঞ্চলে তাপমাত্রা এমনিতেই অনেক বেশি থাকে। সারাবছর ধরেই সেখানকার আকাশে মেঘগর্জন শোনা যায়। যেমন মধ্য আফ্রিকায় কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে তো পৃথিবীর ঝড়ের রাজধানী বলা হয়। সেখানে পাহাড়ি গ্রাম কিফুকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে বছরে ১৫৮ বার বিদ্যুৎ চমকায়। পৃথিবীর সব থেকে বেশি বিদ্যুৎ অঞ্চল বলে তাকে মনে করা হত। তবে ২০১৪ তে নাসার ছবি প্রমান করেছে যে পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এপ্রিল - মে তথা বর্ষার আগমনে মাসিক বিদ্যুৎ চমকানোর হার সব থেকে বেশি। তবে নাম উঠেছে মারাকাইবোরই।

কেন এমনটা ঘটে তাই নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত আছে। ষাটের দশকে কেউ কেউ মনে করতেন মাটির নীচে পাথরে থাকা ইউরেনিয়াম হয়তো আকর্ষণ করছে বিদ্যুৎকে। ইদানীং আবার কেউ মনে করছেন নীচের তৈল খনি থেকে ভেসে আসা মিথেন হ্রদের ওপরের হাওয়ায় মিশে সেই বাতাসকে এমন সুপরিবাহী করে তুলছে, যে তাতেই আকৃষ্ট হচ্ছে ওই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ। তবে বিজ্ঞানীদের কোনও মতই এখনও প্রমানিত হয় নি।

তত্ত্ব যাইহোক, ওই সহস্র বিদ্যুতের ঝলকানি এতটাই তীব্র যে তা প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যায়।

এবং বলা হয় একদা ঔপনিবেশিক নাবিকরা না কি তাদের যাত্রাপথ চিনে নিত ওই বিদ্যুৎ ঝলকানিকে নিশানা করেই।

সত্য যে ঝড়ের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব থেকে নানা গল্প সৃষ্টি হয়, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি সেই বিদ্যুৎ-আলো থেকে নানা রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে।

দেওয়াল লিখন

অতিরিক্ত মাছধরা আর জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রগুলি ও আমাদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে

ওয়ালর্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: September 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● ড্র্যাগনফ্লাই বা জলফড়িঙদের ৬ টা পা থাকে বটে কিন্তু তারা হাঁটতে পারে না।

● বলা হয় উট দীর্ঘ দিন জল না খেয়েও বাঁচতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে জিরাফ ও ইঁদুররা জল না খেয়ে বাঁচতে পারে উটের থেকেও বেশি দিন ।

● ঘুম থেকে উঠে পিঁপড়েরা মানুষের মতোই আড়মোড়া ভাঙে।

● সাপের কামড়ে বছরে যত মানুষের মৃত্যু হয় তার থেকে বেশি মানুষ মারা যায় মৌমাছির কামড়ে।

● মানুষ প্রথম ছাগলকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশু করে তোলে খ্রিস্টের জন্মের ১০,০০০ বছরেরও আগে।

হাঁটাই জীবন

হাঁটুন মশাই, হাঁটুন। আজকাল হেঁটে সুস্থ থাকার পরামর্শ দেন অনেকেই। দিনে নিয়ম করে কিছুটা সময় হাঁটলে শরীর ভাল থাকবে, এমনটাই মনে করা হয়। আর ধারনাটা নেহাৎ ভুল নয়। দেখা গেছে হাঁটলে শরীর চাঙ্গা থাকে। অনেক রোগ ব্যাধি কাছে ঘেঁসতে পারে না। অনেক দিনের ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা রোগও যেন হাঁপ ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। তাই চলাফেরা করার উপায় ছাড়াও, মানুষের পা দুটো সুস্থ থাকার মক্ষম যন্ত্রও বটে। ফলে অনেকেই এখন নিয়ম করে সকাল-সন্ধ্যে হাঁটেন। ইংলন্ডের লন্ডন শহরে তো মেয়ে পুরুষ উভয়কেই, এক ধাপ এগিয়ে, ক্রমাগত ছুটতে দেখা যায়। রাস্তায়, ফুটপাতে, পার্কে, নদীর ধারে দিনের যে কোনও সময় কেউ না কেউ ভারতের সেই অতীত দিনের ডাকহরকরাদের মতো ছুটে চলে। উদ্দেশ্য একটাই – শরীর ঠিক রাখা।

আসলে মানুষের শরীর হাঁটার জন্যই তৈরি। পৃথিবীতে মানুষের আভির্ভাব ২০০,০০০ বা দু লক্ষ বছর আগে। সেই থেকে প্রায় ১,৮৫,০০০ বছর ধরে দিকে দিকে, দেশে দেশে, দলে দলে হেঁটে বেড়িয়েছে তারা স্রেফ খাবারের সন্ধানে। ফলমূল জোগাড় আর শিকার করেই বাঁচতে হয়েছে মানুষকে। শুয়ে বসে থাকার অবসর ছিল খুব কম। না হাঁটলে জুটবে না খাবার, এমটাই ছিল ব্যবস্থা। শরীরের সব কলকব্জাকে তাই হেঁটে বেড়ানো, দৌড়ঝাঁপ আর কঠোর কায়িক শ্রমের জন্য প্রস্তুত করেছিল প্রকৃতি।

কিন্তু হাজার ১৫/২০ বছর আগে, মানুষ যখন চাষ করতে শিখল, তখন থেকে তার জীবনযাত্রা গেল পাল্টে। হাঁটাচলার প্রয়োজন কমল। তারপর যন্ত্রসভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আরওই স্লথ হল জীবন। মানুষের শরীর আর জীবনযাত্রায় দেখা দিল ঘোর অমিল। আর তাই থেকে শুরু হল নানা নতুন ব্যাধির উৎপাত। শরীর ঠিক রাখতে এখন তাই আবার হাঁটার ওপর জোর দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুরা।

সূত্র: ডিসকভার.কম

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। আমেরিকাতে ১৯২১ এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়ানশিপে লাইট হেবিওয়েট বিভাগে বিজয়ী হয়েছিলেন এক ভারতীয়। সেই প্রথম কোনও এশিয়াবাসীর এই কৃতিত্ব। কে?
(ক) গামা (খ) ইমম বক্স (গ) যতীন্দ্র (গবর) গুহ (ঘ) দারা সিং

২। কোনটি ১৯৪৫ এ ঘটে নি?
(ক) হিটলারের আত্মহত্যা (খ)রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থাপনা (গ) বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের মৃত্যু(যদিও অনেকে এটা বিশ্বাস করেন না) (ঘ) কলকাতায় ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

৩। বর্মা বা ব্রহ্মদেশের শাসনব্যবস্থা ভারত থেকে আলাদা হয়েছিল কবে?
(ক) ১৯৩৭ (খ) ১৯৩৫ (গ) ১৯৪৭ (ঘ) ১৯১১

৪। নীচের চারটি স্মারক আর তাদের অবস্থানের মধ্যে কোন জুটিটি ভুল?
(ক) আকবর'র কবর-সিকান্দ্রা (খ) মহাবীর পার্শ্বনাথ'র দেহত্যাগ- পাওয়াপুরি (গ) গুরুনানক'র জীবনাবসান-ডেরা বাবা নানক (ঘ) শেরশাহ'র সমাধি-সাসারাম

৫। এর মধ্যে কোন জায়গাটি ছৌ নাচের কেন্দ্র নয়?
(ক) সম্বলপুর (খ) সেরাইকেল্লা (গ) ময়ূরভঞ্জ (ঘ) পুরুলিয়া

৬। ইস্টইন্ডিয়া কম্পানি দুটি বড় দুর্গ তৈরি করেছিল - ফোর্ট উইলয়াম আর ফোর্ট সেন্ট জর্জ। প্রথমটি কলকাতাতে, অন্যটি?
(ক) কাবুল (খ) মাদ্রাস বা এখনকার চেন্নাই (গ) লাহোর (ঘ) কলোম্ব

৭। কোন মহাদেশে মৌমাছি নেই?

৮। প্যাঁচা চোখের খুব কাছাকাছি জিনিস পরিস্কার দেখতে পায় না; সত্যি কি মিথ্যা?

৯। ১৯৪২ এ মহাত্মা গান্ধী কোন আন্দোলন শুরু করেছিলেন?
(ক) ভারত ছাড়ো (খ) অসহযোগ (গ) আইন অমান্য (ঘ) লবণ সত্যাগ্রহ

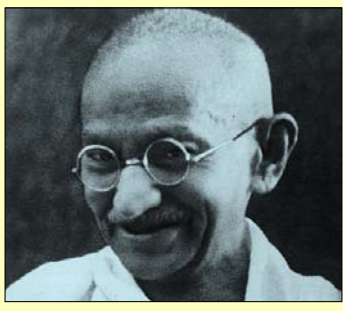

১০। তুলো চাষ মোটামুটি কত বছর আগে শুরু হয়?
(ক) ৪০০০ (খ) ৫০০০ (গ) ৬০০০ (ঘ) ৭০০০

উত্তর: ১/গ; ২/ঘ, এটি হয়েছিল ১৯৪৬ এ; ৩/ক; ৪/গ, এটি করতারপুরে; ৫/ক; ৬/খ; ৭/ দক্ষিণমেরু বা আন্টার্কটিকা; ৮/সত্য; ৯/ক; ১০/ঘ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com